প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৪৯

প্রকাশক
দ্বিজেন্দ্রলাল দত্ত
৯৩/১ এল, বৈঠকখানা রোড
কোলকাতা ৯

মুদ্রক
অধুনার দায়িত্বে
অভ্যুদয় প্রেস প্রাঃ লিঃ
৩০ সূর্য সেন স্ট্রীট
কোলকাতা ৯

বাঁধাই
বি, শর্মা বুক বাইণ্ডার্স
৪০ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কোলকাতা ১২

পরিবেশক
অধুনা
১৭/১-ডি সূর্য সেন স্ট্রীট
কোলকাতা ১২

স্বর্গত পিতৃদেব স্মরণে

সূচিপত্র

মেঘ রৌদ্র

মেঘ রৌদ্র কতবার ঘুরে ফিরে আসে
বর্ষায় শরতে কিংবা গ্রীষ্মের আকাশে,
প্রান্তরের কচি কচি সদ্য-জাগা ঘাসে,
বসন্তের প্রকৃতির নতুন বিন্যাসে।
জীবনেও মেঘ রৌদ্র চিহ্ন এঁকে যায়
কখনো কালিতে কখনো দীপ্ত সোনায়।

হয়তো স্বজন-দেহ নিশ্চিহ্ন শ্মশানে,
নিঃশেষিত ভস্মধূম বৃষ্টি ডেকে আনে!
সে-বৃষ্টিতে জীবনের তাসঘর কাঁপে,
উন্নিদ্র দু'চোখ শুধু সিক্ত রাত্রি যাপে;
তারপর সূর্য উঠে : বৃষ্টির বিষাদ
সরে গিয়ে রোদ্দুরের উষ্ণ এক স্বাদ।

এ-পথিক জীবনের তৃষিত অধরে
মেঘ রৌদ্র অবিরাম উল্কা হয়ে ঝরে।

আত্মগত

আমার ভিতরে বারুদ আছে, বারুদ,
হৃদয়ে আমার বেদনা আছে অরুন্তুদ।

আমার ভিতরে বাসনা, কত বাসনা,
হৃদয়ে আমার হতাশার স্বাদ লোনা।

আমার ভিতরে নরক, গুপ্ত নরক,
হৃদয়ে আমার স্বর্গ দেখার বিষণ্ণ সখ।

আমার ভিতরে নাবিক, মত্ত নাবিক,
হৃদয়ে আমার নিমজ্জমান পায় না দিক।

নির্জনতায় রোরুদ্য মন আর কেঁদো না,
হৃদয়ে আমার যন্ত্রণাতুর প্রহর-গোনা।

খোলা চিঠি

(এখন দুপুর।
দখিনা জানালা খোলা,
উঠোনেতে মুঠো মুঠো জাফরান রোদ,
গাছের পাতারা কাঁপে,
আঙিনায় পদাতিক ছায়াসেনা
ধীরে পথ হাঁটে,
এখন সময় ক্লান্ত,
আশেপাশে ছায়া শরীরীরা কথা কয়—
এই ঠিক চিঠির সময়।)

সুচরিতেষু
বন্ধু ইন্দ্রনীল,
তোমাকে বহুদিন দেখিনি, ইত্যাদি
প্রথমেই সুরু করে সস্তা চাটুবাদী
আজ আর হব না।
সোনালী দুপুরবেলা
এ-হৃদয় নৈকষ্য সোনা,
সামাজিক ভব্যতার ছদ্মখেলা
আজ আর স্মরণে নেই,
বন্ধু তোমাকেই
আজকে দু'কথা হৃষ্ট
ভেবেছি চিঠিতে লিখব।

দুপুরে কি ঘুমোও, ইন্দ্র ?
নাকি জেগে আছ ?
এ-আকাশ দেখে দেখে
আমারি সদৃশ

বীতনিদ্র হয়ে গেছ শেষে
ক্ষেপাটে আবেশে ?

(ধুত্তোর ! ফেনায়িত আবেগের ভাষা
নদীরাই ভাল জানে :
অস্পষ্ট কুয়াশা--
হে হৃদয়, কী যে লিখি কী যে লিখি বলো
বড় আগোছালো কথাগুলো সব।)

এখন কি ভাবনায় অন্তর্মগ্ন আছ ?
চেনামুখ অথবা চর্বিত স্মৃতির সুখ
পেতে উৎসুক হয়ে
ফেরারী দিনের খোঁজে ফিরে তাকিয়েছ ?

এ-দুপুর কি তোমারো কানে
হাওয়ার শব্দে রৌদ্রের উত্তাপে
মৌনতায় নিক্কণিত গান গায়
মধ্যদিনের ঘুমভাঙানির গান ?

(ইন্দ্রকে কী যে বলতে চাই !
চিন্তাগুলি আকস্মিক উল্লম্ফনে চলে—
হায় মন ! বার বার নিজেকে হারাই,
হৃদয়ের অনুভূতি সব এলোমেলো।)

পলাতক দিনগুলি সব
বিস্মৃতির কফিনেতে শুয়ে আছে
মিশরীয় মমির মতন।
একবার কফিনটা খুলো না—
শুনে দেখো মমি-হওয়া দিবসের কান্না।

ইন্দ্র, তোমার কি মনে পড়ে

কামাখ্যা পাহাড়,
নির্জনতায় ঘেরা ছায়ালীন দিন,
প্রবাহিনী ব্রহ্মপুত্র :
শাশ্বত প্রহরা,
শব্দঝরা বন,
কফিনের গায়ে আঁকা ছবির মতন
মনে পড়ে ?

আবার সেখানে যেতে হবে ;
মেঘ-রোদ্দুর সব পেরিয়ে
আরো আরো দূর
চড়াই-উৎরাই, পাকদণ্ডী দিয়ে
জীবনের মুসাফির হতে হবে।

(ঘুম-ঘুম দুপুর নিঝুম।
এখানে কোথাও ইন্দ্র নেই !
চিঠি লেখা এই থাক, আর না।
বন, বাতাস, পাহাড়, আকাশ
নীলিম, নিঃশেষ।
সত্তার মুখোমুখি
নিঃসঙ্গ, একাকী দাঁড়িয়েছি
নিজেই নিজের শেষ
নিখোঁজ, নিরুদ্দেশ।)

সেই যুবকটি

হাফ-হাতা সার্ট গায়ে যুবককে দেখা যেত প্রায়
অসময়ে সকালে দুপুরে অথবা সন্ধ্যাবেলায়
শহরের রাজপথ থেকে কোনো অলিতে-গলিতে
ছন্নছাড়া জীবনের এলোমেলো পথ হেঁটে যেতে।

মেঘের পর্দার থেকে সহসা তাকালে চাঁদ হেসে
কাকে যেন খুঁজে খুঁজে যুবকটি বলেছিল শেষে :
'আমার বুকের এই ভালোবাসা কাকে দেব, কাকে?'
হাওয়া লুফে নিয়েছিল উদ্‌ভ্রান্ত তার কথাকে।

হৃদয় দেবার তরে সাধ ছিল আশ্চর্য যুবার :
'একবুক ভালোবাসা দেব আমি, কে আছে নেবার?'
দু'চোখে কৌতুক নিয়ে কেউ-কেউ কাছে এসেছিল,
বলেছিল : 'এই তো এসেছি কাছে, কী দেবে বলো!'

'ভালোবাসা' : বলেছিল, চোখ তার যেন ধ্রুবতারা!
'বায়ব শূন্যতা দিয়ে জীবন কি কভু যায় ভরা?'
তারা সব বলেছিল। সে-যুবক কি নির্জন রাতে
কেঁদেছিল তারপর সঙ্গিহীন শূন্য সাহারাতে!

অনেক চেয়েছে দিতে তার দান কেউ তো নিলে না,
কী করে সে শুধে গেছে তার সব জীবনের দেনা;
যুবার সবুজ মন একদিন পুড়ে পীত হলে
কোন কি হৃদয়বতী তার তরে অশ্রুকণা দিলে?

যে-পাখিটি পোষ মানে না

যে-পাখিটি পোষ মানে না দুরন্ত তার ছটফটানি
ভরদুপুরে ভোঁ-উড়ুনি রোদে পোড়া ঘাসের জমি
দালানকোঠার ঘুলঘুলি আর আমড়া গাছটি নেংটাবুড়ো
তার কাছে যে সবই সমান সবই সমান—
বার ঘরের এক উঠোনে জটলা করে আড্ডা মারে
হঠাৎ পালায় দলছাড়া ও একা-একা !
পোষ মানে না জানাই আছে তবে কেন ইচ্ছা করা ?

সে-পাখিকে হঠাৎ দেখি আমার বুকে তোমার বুকে
ছুঁচলো ঠোঁটে ঠোকর মারে হাড়-পাঁজরে
শব্দ করে সময় ঝরে বুকের ঘড়ি ঠিকই বাজে
এক ডালে তো মন বসে না আবডালে তাই উড়া-ঘোরা
কীসের তরে ছটফটানি ?   সবুজ জমি হবেই নেড়া
তার পরাণই তাকে উড়ায় তাকে ঘুরায়
তুমি কী জানো ?   আমি কী জানি ?

বাবুই পাখির বাসা

টেলিগ্রাফের তারে ঝুলন্ত বাবুই পাখির বাসা :
ভেতরটা খালি, পাখিটা থাকে না,
আমিও তো পাখির মতই
ঝুলন্ত হয়ে আছি, থাকবই—
এই মন স্মৃতি ও স্বপ্ন আঁকে না,
পাখির সঙ্গে উড়িয়ে দিয়েছি সমস্ত ভালোবাসা।

হঠাৎ ঝড়ের রাতে বাসায় অন্য পাখি এলে
সে-পাখি কি দূর থেকে টের পায় ?
তুমিও তো তার মত সই
দূরে ছিলে, দূরেতে আছই—
অভিমান জমে কী ঈর্ষায় !
আসবে না তুমি কভু তোমার সে-স্বভাবকে ফেলে

শুধুই স্বভাব

না দেখালে জানা তো যাবে না
তা-দেয়া পাখির মত কেন ওই ফুলে-উঠা বুক।
রাঙা ডিম তার নিচে আছে কি লুকোনো ?
নষ্ট হলে ফুটে আর ছানা তো হবে না
সময় ফুরোলে আঘাত যত-না হানো,
মেঘের দুঃখের থেকে ফুটবে না রোদ্দুরের সুখ !

অবিরাম কথা বলা প্রবল ফুৎকারে
তোমার বুকের শাঁখে কোনো ধ্বনি কখনো তোলে না,
জাগে না রক্তের ঢেউ ছলাৎ-ছলাৎ ?
শুধুই স্বভাববশে নিদ্রায় আহারে
আঁধারেই কাটে সকল রূপালী রাত ?
সময়ের দাম দিয়ে স্বভাবকে যদি যায় কেনা !

পকেটমার

আলো-জ্বলা ভিড়ে গেলে সন্ধ্যার তিমিরে
অত্যন্ত সহজে ভোলা যায়
বাইরে কোথাও অন্ধকার
প্রস্তরখণ্ডের মত ভারি হয় ধীরে।

শরীর তো ঘামে ভিজে, মনটা ভিজুক
আলোর বৃষ্টিতে কিছুটা সময়,
আসক্তি অভ্যস্ত হলে মনে হবে
এইভাবে ভেজাটাই সবকিছু সুখ!

শরীর মনকে নিয়ে এত ছোঁয়াছুঁয়ি!
তবু এই আলো-জ্বলা ভিড়
আগুন নেভাতে পারে কই?
একদেহে জ্বর-ঘাম মিশে থাকে দুই-ই!

সময় খরচ করে বিনিময়ে তার
যা-কিছু কেনা হল সব সঞ্চয়
বুকের পকেটে রেখে পথে এলে
পিছু নেয় ভুলে-থাকা সে-পকেটমার।

জনৈকা-কে

ওই পথে যেয়ো নাক' তুমি
ওই পথ সর্বনাশী পথ :
সার্কাসী মেয়ের শূন্যভূমি
ট্রাপিজের খেলার কসরৎ !

ওই পথ কানাগলিপথ,
ঢুকে গেলে বেরোবে না তুমি ;
বলো না : 'কে আছে সর্বত-সৎ ?
আমি নই বিধবা বোষ্টুমি।'

এও কি সার্কাসী খেলা, বলো ?
আর সব বাঘ, তুমি পাখি !
সৌখীন যদি দোলনা ঝুলো,
পড়ে গেলে আক্রান্ত একাকী !

মোড়ের ল্যাম্পোষ্টে জ্বলে বাতি,
আঁধারের ব্যূহ ভেতরেই ;
ঔদ্ধত্যে হয়ো না আত্মঘাতী,
বেরোনোর মন্ত্র জানা নেই !

আঁধারে সুঠাম তনু মাটি
হলে তাতে গজাবে না ঘাস,
অদূরের প্রেমের দোপাটি
বিলাবে না বিমুগ্ধ সুবাস।

কেন যে

কেন যে ঝড়ো দস্যুর মত আসে তারা—
ভেঙে দেয় ঝিমুনো কপাট,
মিথ্যে হয় সদরে পাহারা,
চলে গেলে এলোমেলো সব খোলা হাট!

সবি তো সাজানো ছিল সুরক্ষিত করে!
তবে কি সে স্ফীতি-সংকোচনে
ছিটকিনি ঢিলে নড়বড়ে
ক্লান্তিতে সংগ্রামে রোজ রোদে ও বর্ষণে

যে-মুখ মুখোস-পরা চোখের তারায়
সে-দস্যুতা অজেয় নিয়তি;
কখনো কি কেউ ভুলে যায়
একবার নিঃস্ব হলে এ-জন্মের ক্ষতি?

দিনের রক্তের লাল শয্যায় ঘুমোলে
হয়ে যায় বুঝি সাদা হিম,
অলুণ্ঠিত চিলেকোঠা খুলে
পুরনো নূপুর কেউ শোনে ঝিমঝিম।

যুবকের মন

জীবনকে মেপে মেপে যাপন তো যায় না !

ঘরেতে অসহ্য প্রাণ, গরম গুমোট,
রাস্তায় বেরোনো চাই যদি ছায়াবট
মিলে যায় আশে পাশে যাবে তো জিয়ানো,
দশ-পঁচিশের কড়ি হতে পারে প্রাণও।

স্বোপার্জিত যদিও না পৈতৃক আসলে
এই মন এই প্রাণ তবু মূলধন
বেঁচে থাকা ব্যবসাতে ইনভেস্ট হলে
অন্তত প্রফিট কিছু হবে তো তখন !

ট্রাম-বাস-কোলাহল যাবে গান গেয়ে,
আবার ঘরের মায়া এলে কোনো মেয়ে
প্রেম নিয়ে কাছাকাছি, মুনাফার লোভে
মূলধন মার খেলে মনে হবে ক্ষোভে :

টেনে টেনে এ-জীবন আর তো ফুরায় না···

শব্দরা স্মৃতিরা

আসলে মৌনতা নয়, প্রচণ্ড মুখরিত
স্মৃতিরা কাঁপিয়ে দেয় রাত !
রাত্রির বুকে জোনাকির লুটোপুটি,
রাত্রির কানে ঝিঁঝির চতুর আলাপ,
এবং নির্ঘুম মনে ঝরে পড়ে শব্দের প্রপাত।

শুধুই মানুষ নয়, শব্দরাও খুবই সঙ্গিহীন
ক্রমশ নির্বাক হলে রাত,
পুরনো স্মৃতির শাড়ি পরে সদ্য-যুবতীর মত
পেতে চায় পুরুষের বুকের উত্তাপ,
তবুও পুরুষ কিছুটা ঘুমিয়ে চায় আগামী সুপ্রভাত !

অমিল

মনে করুন আমি আপনাকে বললাম :
এই যে দাদা বেঁচে আছেন তো !
আপনি ঘুমের পাতাল থেকে চোখের সুড়ঙ্গ দিয়ে
শব্দহীন উঠে এসে দেখালেন, কতটুকু বেঁচে···

অথচ আমি তো জীবনকে নদী মনে করি,
নদীকে জানি অন্তহীন শব্দের প্রবাহ···

মনে করুন এবার আপনি আমাকে বললেন :
আমি সীমাকে নিয়ে এখনো ভাবছি কিনা !
আপনার নখাগ্রে অনেক মেয়ের বয়েস,
জানেন না বিয়ের পর সীমা গ্যাস্ট্রিকের রোগী ?
ভাগ্যিস অরূপটা ছিল বলে সে-যাত্রা বাঁচোয়া !

অথচ আপনি ভাবেন প্রেমটা নিখুঁত আয়না
দেখা যায় যাতে মুক্ত আকাশ আর নিজেদের মুখ···

আপনি নামুন।   আমি তথাপি রাতের ট্রামেই চড়ে
চলে যেতে চাই নিহত সময় পেরিয়ে কিছুটা দূর···

বাস্টার্ড

আমাকে বরং দাও কিছুটা টাটকা ঘৃণা
ভালোবাসা উচ্ছিষ্ট মলিন :
মার্কিনী ছাতার নীচে কতকাল মাথারক্ষা
তীব্র ছুঁড়ে বৃষ্টিভেজা দিন।

না হয় ঢালো কিছু সূর্যের ফুটন্ত গরম
যার ছোঁয়া টগবগে লাল,
অন্ধকার জ্বলে পুড়ে অবশেষে ফর্সা হবে
প্রতারক স্বপ্নের পাতাল।

আমি সেই তাজা ঘৃণা বুকে নিয়ে দেখে যাব
ঈশ্বরের মানুষের শব—
অগ্ন্যুৎগীর্ণ আকাশে যে জন্ম নেবে, সেই হবে
অনাহুত জারজ প্রসব।

যাদু-ঘুম

পৃথিবীকে হারামির বাচ্চা বলে গালি দিয়ে
রাত-দুপুরে কষ্টার্জিত ঘুম।
ঘুমের অন্দরমহল মলিন ধুতির মত,
লেপটানো স্বপ্নের মরা রক্তের কালশিটে,
প্রেম-আশা-আদর্শের রাজা-মন্ত্রী-প্রজা
কেউ তো স্বস্থানে নেই ;
ওলট-পালট এবং স্থানাভাব !
যাদুঅলা বলতে পারে কী করে হঠাৎ
ম্যাজিক তাসের টেক্কা নওলা হয়ে যায় !

প্রথম জন্মের রং চটে গেলে (যদিচ এটাই নিয়ম)
সরল বিকল্প নেই।
যা আছে তা হৃৎপিণ্ডে খিচুনি, তলপেটে ব্যথা,
দুর্গন্ধ ঢেঁকুর এবং বমির বদলে কিছু ঘুম।

এলোমেলো

১

শুনেছি জগৎ মায়িক এবং ঝুটা

তবে কেন এই ক্লান্ত কায়িক ছুটা

ভাবতে গেলেই সকল অসার দেখি

সত্য শুধুই কপালে ঘামের ফোঁটা !

২

বিপ্লবে ভাসে আজ এই দেশ !

বিপ্লব দেখি খুনোখুনিতে,

বক্তৃতা, পোস্টারে অভ্যেস,

নানামত আছে নানা মুনিতে,

ভুখো পেট করে যে হা-পিত্যেশ,

দিন মাস চলে যায় গুনিতে,

নেতাদের হেঁয়ালি ও নির্দেশ

কতকাল হবে আর শুনিতে ?

বিকেলে

ইরানী মেয়ের মত বিকেলটা মাঠের উপরে
কালো বোরখাটা যেই নিল পরে,
আমি একটা সিগ্রেট ধরাই ;
তারপর কয়েকটা ছাই
রঙের ধোঁয়ার আংটি ছেড়ে দিই ;
নির্জনে এই সময়টা উপভোগ্য লাগে,
এলোমেলো কথা বলা ভালো লাগে।
'কার সাথে কথা বলা যায়' ভেবে তাকাতেই
দেখি শুধু আমি বসে, আর কেউ নেই।

পথ চলা

মিঠে রোদে পথে এলে কেউ কভু বলে এ-রকম :
'চলুন না এক সাথে হাঁটা যাক্।'
পাশাপাশি দুই পথচারী।

দুপুরের অবসাদে নুয়ে পড়ে শরীরের রোম,
তারা শোনে কর্কশ কাকের ডাক,
তারপর ফিরে যায় বাড়ি।

সবিতা সম্পর্কিত

সবিতার মুখ চেয়ে কাক-ভোরে জাগা ?
ভুল্ করছেন, এখন তেমনটি আর নই,
ও-মুখে আসক্তি নেই,
বয়সের ধাক্কা খেয়ে উঠতে গিয়ে পিছুই।
নিকানো উঠোনে একই তো জবাকুসুম !
কী আর দেখব ? দেখে দেখে চোখ সহা।
আসলে ক্লান্তি বেশি, নিষ্ঠাহীন,
নিয়মে বিশ্বাস নেই, সবি সত্য।
অতএব একাকীত্বে আরামপ্রিয়তা এবং ঘুম—
মানে, যে-রকম বললুম :
জানালা দিয়ে আলোর হাত ধরতে এলে জাগি,
ও-হাত বিরক্তিকর,
সময় পেরুলে সবিতা কিছুটা করবেই রাগারাগি !
সুতরাং আমি ছায়ার কাছেই যাই—
ছায়া, মানে কবিতার আদরের নাম,
আর তারপর
সংলাপের জন্য টাটকা শব্দ খুঁজি ;
স্মৃতিকে বলি : 'এই স্মৃতি শব্দ দেবে ?'
সবিতার বান্ধবী বলে তার ক্রুদ্ধ প্রত্যাখ্যান !
অথচ কথা ছিল সবিতা তার শাড়ি খুলে
মোহিনী রূপ দেখাবে,
সে তো কথা রাখে নি।
ছায়ার কাছে নির্বাক কত আর বসা যায় ?
স্বাভাবিক ক্লান্তি আসে, ক্লান্তি, তুড়ি, ঘুম।

মফস্বল থেকে ফোন

রুমি, তোমায় ফোন করছি অনেক বছর পরে
চিনছ নাকি ? সে-সব দিনে চিনতে পেতে শুধুই গলার স্বরে
(সে-সব দিন তো হারিয়ে গেছে কবে !)
আজকে তোমায় এক বাস্কেট বাতিল স্মৃতি মিছেই খুঁজতে হবে।
তখন তুমি বলতে যে খুব রাখবে মনে
সারাটাকাল এই জীবনে ?
এই তো জীবন ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !
সকালবেলায় বৃষ্টি হলে দগ্ধ দুপুর উদাস খাঁ খাঁ।
নান্ না, রুমি, মনে করিনি, কিচ্ছুটি না—
ফোনের গলা ঝাপসা শোনায়, অচিন লাগে, তাও তো আবার দূরের কিনা !

তারপর সব খবর ভালো ? শরীর-টরীর, মনের খবর ?
আমি মানে আগের মতই মধ্যরাতে বুকের ভিতর
মাঝে মাঝে অসুখ করে,
শুনতে থাকি এদিক-ওদিক শোবার ঘরে
ভূতুড়ে সব ফিসফিসানি,
কান্না এবং কানাকানি ;
বিশেষ কি আর, আগের মতই খুড়িয়ে চলা, বিবর্ণ মন—
পানসে লাগে আড্ডা যখন,
পুরনো মুখ বিরক্তিকর, নতুন খুঁজি,
হাঁটতে থাকি রাজপথে আর গলিঘুঁজি ;
পাঁচ মিনিটেই বুঝতে পারি লাভ হবে না,
এই শহরের সমস্ত মুখ বড্ড চেনা,
সমস্ত পথ মাড়িয়ে গেছি,
সকল কিছু ভাল্লাগা-সুখ পান করেছি,
নতুন তো নেই !
মনে পড়ে তোমায় এবং কোলকাতাকেই।

বুঝতে পাচ্ছ ছোট্ট শহর, গড়িয়ে চলা দিনরাত্তির,
মাঝে মাঝে সুখের ইচ্ছা ছড়ায় মনে রাঙা আবীর :
ইচ্ছা করে তুমি এলে (আসবে নাকি ?)
কয়েকটা দিন পালটে যেত, বুঝতে পেতাম জীবনটা কী ;
থাকতে শুধু কাছে-পাশে,
তখন কী যে অনায়াসে
পেরিয়ে যেতাম
সকল কিছু মন্দলাগা, নক্সালী ক্রোধ, বিষাদ এবং চুঁয়োনো ঘাম

অনেক বছর পরে যে আজ এই অবেলায়
মফস্বলের থেকে ফোনে ডাকব তোমায়,
নিজের কাছেই অভাবিত ;
যদি ডিস্টার্ব করে থাকি তো
ক্ষমা চাওয়ার লৌকিকতা,
করব না তা ;
বরং জানি কাজের ভিড়ে তুমিও ভোলো, আমিও ভুলি,
তার চেয়ে থাক্ রোজনামচার পাতাগুলি।

কবিতার বদলে

কবিতার বদলে কী দেব ভাই ?
গল্প চাই,
প্রবন্ধ বা একাঙ্কিকা, ফিচার, স্কেচ ?
ব্যক্তিগত চিন্তা কিছু করব পেশ ?
ভ্রমণকথা আর কিছু কি ?
যা বললাম সবই লিখি।
তবুও যদি পাঠক কিংবা সম্পাদকের মাথা-ঝাঁকি,
কী করে কার মন রাখি !
একটি মিনিট উঁহু !
ধৈর্যং রহু,
নিজেই ভাবুন কাকের বাসায় কোথায় পাবেন কুহু !

আগে ভাবতাম বিশ্বের এ-যুগ প্রসব-ব্যথায় কাতর;
নেহাৎ কিছু অবসর,
তারপর সব ঠিকঠাক,
কখন ভোরে ঘুম ভাঙাবে কাক,
দেখতে পাব অপাপ শিশু দু'চোখ অবাক্ !
অথচ এখন কাক জানাচ্ছে রোজ
মৃতবৎসার দেহকে ঘিরে বসেছে ভোজ !

কবিতা লেখার সময় এলে বুঝতে পারি
রূপনগরে কুলুপ-মারা সব দুয়ারই।
তার মানে এই :
নারীর মাঝে ঐশিতা নেই,
রোমাঞ্চিত হওয়া যায় না চাঁদকে দেখেই,
মানুষ মানেই কথার ফানুস,
ভেতর-ফাঁপা খোলস নাদুস,

সম্পর্করা দাবার ঘুঁটি,
প্রেম যেন সে রাঙা হলেই ভেঙে যাওয়া মোরগ-ঝুটি,
জীবন এখন যা-তা ব্যাপার একেবারে যা-তা—
হৃদয়-মনকে উল্টো-হরফে পড়ে গেলে ঠিক যা হয় তা!
অতএব এ রক্তের ঘুণ—
কবিতার মুখ প্রসাধনহীন, ময়লা, করুণ!
রেল কামরায় বুড়োদের প্রায় ঝরে আবেগ:
কী ছিল আর কী ছিল না কবে সেই প্লেগ,
লড়াই-দাঙ্গা
দেশবিভাগ ও বাস্তুহারা, স্বদেশ-ভিটে রক্তরাঙা
কার বউ-ঝি রক্ত দিল
ব্ল্যাকাউটে কে সব খোয়াল
অবশেষে সদ্য-শিশু পড়ল মারা
জমাট তুষার চোখের ধারা!

কী করে যে মরল শিশু কাকে শুধবেন?
জ্ঞানপাপীরা অনেক আগেই স্বর্গে গেছেন!

মৃতবৎসা কিংবা কোনো ফুলকুমারী বুকের
নেতিয়ে-পড়া মরা পদ্মের
সে-কষ্টকে
দেখেছি চোখে।
কবিতা ছিল বাকি
তারি কপালে অসহায় হাত রাখি।

কবিতার মাঠ ফেটে চৌচির বহু আগে
জুড়বে না তা মুষ্টিমেয়ের অনুরাগে
প্রজন্ম আজ জ্বলুক যতই হতাশ রাগে!
তার মানে এই:
ফুল ফুটবার আগে কুঁড়িতেই

নিজের গন্ধ সে-ই পেল না
হায়, কেননা
পার্শ্ববর্তী সব বুনো ঘাস
মক্ষিরাণী, রৌদ্র, বাতাস
সবি নষ্ট, শুদ্ধতাহীন, কেউও তো না
নিখাদ সোনা !

কবিতা বাদে কী চাই বলুন কী দেব আজ ?
শ্বাসকষ্ট, বন্য আওয়াজ,
অম্ল ঢেঁকুর, তিক্ত স্মৃতি,
বাগযুদ্ধের নতুন রীতি,
বই পড়েছি, লোক দেখেছি, দেশ ঘুরে আর কী পেয়েছি
অন্ধকারে কী করে আজ সেঁধিয়ে গেছি,
পরখ করার জন্যে কিছু পাটকিলে খুন ?
ভেবে চিন্তে অন্য সময় কী চাই বলুন।

শ্রুতির সঙ্গে প্রেম

দিনের জ্বরের শেষে সন্ধ্যার ভেজা মুখশ্রীকে
দেখলেই সন্তদের ঈশ্বরজীকে
মনে পড়তে পারে অথবা যেমন
নমাজের জন্য জাফর আলির মন
হঠাৎ প্রস্তুত
ঘড়ির কাঁটার শব্দে মুমূর্ষুর মনে পড়ে মরণের দূত
দুঃখীদের কি মনে পড়ে গীর্জার ধ্বনিকে
পিকলুর হারানো ছোড়দিকে
পাখিদের মনে পড়ে নীড়
আমি সোজা চলে যাই বাড়িতে শ্রুতির।

ফটক পেরোতেই ওকে দেখা যায়
দোতলার ঝুলবারান্দায়
মন্দিরের চূড়োর মত
উন্মুখ, করুণ, অপেক্ষিত।
আমাকে দেখেই শ্রুতি দ্রুত
সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে সবাক্, উল্লসিত :
'ওম্মা, জন্ম যে!'
আমি শুধু প্রেমেরই খোঁজে
এখানে এসেছি বলে সুস্মিত, লাজুক।
অথচ শ্রুতি আগে তার দুইখানা বুক
আমারই চোখের সামনে সযত্নে অদৃশ্য করে
সুরক্ষিত দুর্গের মত মুখোমুখি স্থির বসে পড়ে।
আমার ইচ্ছা করে চীৎকার করে
বিস্ফোরক শব্দ ছুঁড়ে বলি : 'তুমি কি জানো না, সই,
আমি আক্রমণকারী নই,
লুঠেরা বা জলদস্যু নই

তবু তুমি মিছিমিছি দুর্গের ভিতরে
অথচ তোমার হাত ধরে
কী সহজে যাওয়া যায়
অন্দরমহলে কিংবা ঝুলবারান্দায় !'

অতঃপর কথাবার্তা বলে কিছু সময় গড়ায়।
সন্ধ্যা বয়স্ক হলে সহসা এক অচেনা যুবক
আমার যতই অচেনা হোক
শ্রুতি বলে, ওর মামীমার ভাই বলে মামা
এলোমেলো চুল আর ঢিলে পাজামা
পরে দুজনের মাঝখানে আবির্ভূত হলে
শ্রুতি হেসে তাকে বসতে বলে।
আমি দেখি, কথা বলতে গিয়ে শ্রুতি হেসে হচ্ছে খুন
হাওয়া-ছাড়া চুপসানো মনের বেলুন
বুকে নিয়ে আমি চুপচাপ।
শ্রুতি কী হাসতে পারে, উরে ব্বাপ্ !
হাসতে হাসতে ওর কাপড় ঢিলেঢালা হয়ে যায়
আমি চোখ বন্ধ করি, ছেলেটা তাকায় ;
ছলকে-ওঠা ঢেউয়ের মতন
দুলে ওঠে ওর দেহের স্ত্রীধন,
আমি হঠাৎ দেখে ফেলি,
নিজেকে শাসিয়ে বলি : 'তুই শালা খেলো হয়ে গেলি।'

শূন্য ঝুলবারান্দা দেখে বাড়ন্ত আঁধারে আমি জোরে পা ফেলি।

অন্ধকারে আমরা তিনজন

অন্ধকারে আমরা তিনজন : আমি প্রণব আর অমি
কী করে যে বাসযোগ্য জমি
নষ্ট হল তাই
তর্ক করতে করতে সময় কাটাই।

আমাদের দিকে ফুটন্ত অন্ধকার বাড়িয়ে দিয়ে
রাত্রি বলে : 'বাবুজী, পীজিয়ে।'

প্রণব বলে : 'চল তো শালা সরাইখানায় চল।'
অমি বলে : 'এইখানেই খেয়ে নে না রাতের গরল।'

অতঃপর অন্ধকার চোখে নিয়ে
স্মৃতিতে চিন্তায় নিয়ে
আমরা তিনজন পাঁড়মাতাল
নিজেদের সভ্যতার দুঃখের জঞ্জাল
ভেবে নিয়ে বসে থাকি।

বহুদূরে ট্রেন ডাকে যেন এক প্রিমিটিভ পাখি।

অন্ধকারে আমরা অনেক : আমি প্রণব ও অমি
এবং দুঃখ-হতাশা-ঘৃণা-ক্রোধ আর গা-বমি।

অন্দর থেকে বারান্দা

ঈশ্বরবাবু মানে আমার স্মৃতিহীন বাল্যের
অঙ্কের মাষ্টারমশাই আমাকে একদিন
বলেছিলেন ; 'ক-খ ব্যাসার্ধ নিয়ে
একটি বৃত্ত আঁকো তো হে।'
মাষ্টারমশাই সেই থেকে
অদ্যাপি নিখোঁজ……

কালো শ্লেটে আমি কিছু হিজিবিজি লিখি,
ক যদি অন্দর হয় / খ তবে বারান্দা নিশ্চয় :
ইত্যাকার পদ্যও দু'চার,
শ্লেটে ক্রমে রচি এক
সাঙ্কেতিক কোষ……

কাকে যে কেন্দ্র করে বৃত্ত আঁকতে হবে
সেটা আজো যায়নি তো জানা !
অন্দর থেকে বারান্দায় এবং
বারান্দা থেকে অন্দরে আমি
ঘোরাফেরা করি……

কখনো হঠাৎ এই অজ্যামিতিক জীবনে
পদাঙ্কমালায় যদি রামধনুর মতন
এক ভাঙাবৃত্ত হয়……

সাঁইতিরিশ